



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 134 - 139

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

শিশু-কিশোর সাহিত্যে কল্পনার জগৎ এবং বনফুলের সাহিত্য

ড. কৌষেয়ী ব্যানার্জি

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, কোলকাতা

Email ID: kausheyee.banerjee@adamasuniversity.ac.in

 0000-0001-9326-3851

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Human mind,
Fairy tales,
Folk stories,
Emotional
liberation,
Bonophool,
Natural,
Freedom
impartial,
Perspective.

Abstract

Deep within the human mind resides a world of imagination—an enchanting realm which, though governed by logic and science, cannot be denied. The seeds of imagination first sprout in childhood, where fairy tales, folk stories, fears, demons and ogres, and mythological narratives together awaken a sense of boundless wonder in a young heart. To escape the sorrows, deprivations, and exhaustion of real life, humans seek refuge in imagination; hence, fairy tales are never solely for children—adults too find emotional liberation in them.

This very world of imagination is what Bonophool infused with a unique dimension in children's literature through his scientifically impartial perspective and sharp sense of humour. The natural freedom, curiosity, emotions, and adventurous spirit of a child's mind take shape in his stories in forms that are extremely brief yet deeply artistic. The harmony between the real and the surreal, the unrestricted movement of imagination, and the pure light of humanity have established Bonophool's stories in a distinguished place within children's literature.

Discussion

সমাজবদ্ধ যুক্তি-শাসিত বৈজ্ঞানিক মনের ব্যক্তি মানসের চৈতন্যের গভীরে নিবিড়ভাবে বাসা বেধে থাকে এক মস্ত বড় কল্পনার জগৎ। এই জগতে আমরা থাকি না, অথচ একে অস্বীকার করার শক্তিটুকুও আমাদের নেই। পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে বঞ্চিতকে অনুভব করার অতিপ্রাচীন বাসনা নিয়ে মানুষের মন রোমান্টিকতাকে স্পর্শ করার নেশায় যখন বৃন্দ হয়ে থাকে তখনই জন্ম নেয় রূপকথা বা গল্পকথা। কল্পনার জগৎ পরিচিত অপরিচিতদের মাঝে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের জগতের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে যায় সামাজিক মানুষের মনের কাছাকাছি। মানব মনে শৈশবের কচি কিশলয়ে সুপ্ত থাকা কল্পলোকে প্রথম যেদিন মহাসাগরের সমুদ্র সংগীত বেজে উঠেছিল, সেদিন তার স্বপ্ন দেখা চোখে ধরা পড়েছিল অসীম আকাশের নিবিড় ঘন নীল নিঃসীমতা। নৈঃশব্দের উদাসী বাতাসে তার মন পাড়ি জমিয়েছিল পক্ষীরাজের পিঠে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোন এক বেঙ্গমা-বেঙ্গমির দেশে। ভাবনা আর কল্পনার আবির্ভাবের রাঙানো নীলকণ্ঠ পাখির পালক আর পানকৌড়ির ডুব সাঁতারে সজারু আর হাঁসের হাঁসজারু হওয়ার আনন্দে মেতে ওঠার দিনে ছোট্ট মনের কোণে চিলে কোঠার ঘরের এক চিলতে বারান্দায় উঁকি দেয় এক অবাস্তবীয় সাহিত্য-কথা। মা ঠাকুমার বৃষ্টি ভেজা রাতে লঠনের আলো-আঁধারিতে রাক্ষস

খোক্ষসের দল শিশু-মনের অন্তঃস্থলে সুপ্ত থাকা কল্পনার জগতটাকে যেমন বারবার নাড়িয়ে দিয়ে যায়, তেমনি ছুঁয়ে যায় বড় মানুষের বাস্তব যুক্তিবোধের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা কল্পলোককেও। আসলে কল্পনার জগতের জন্ম হয় মানুষের সুপ্ত বাসনা, মনের আবেগ, আর প্রবল ইচ্ছাশক্তি থেকে। যদিও শিশুমনই এর সূতিকাগৃহ, তবুও বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা যুক্তিবাদী মন এক মুহূর্তের জন্যও সান্ত্বনা খুঁজে পায় রূপকথার সেই অচিন পাখির সুরে। প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই সামাজিক জটিলতা আর পারিবারিক উত্থান পতনের পাশে মানসিক দ্বন্দ্বের দোদুল্যমান টানাপোড়েনে ক্লান্ত মন বস্ত্রলোকের রূঢ় আঘাত থেকে মুক্তি পেতে যা দেয় মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা কল্পলোকে। চাওয়া পাওয়ার অংক কষা জীবনের বাইরে নিখাদ সারল্য মাখা অসম্পূর্ণতা হীন রূপকথার বাস্তবতায় কল্পনা জাল বোনা ক্লাস্তি জুড়ানো মন হারিয়ে যেতে চায় কঠিন মাটির স্পর্শ থেকে। মানুষের মনের চূপকথারা সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে ওঠে, তাদের মনে বেজে ওঠে ভাবনার জলতরঙ্গ।

যন্ত্র আর বিজ্ঞানের লৌকিক ধারাবাহিক জীবন প্রবাহের মধ্যে থেকে ভিনগ্রহের প্রাণী তথা এলিয়েনদের সন্ধান মানুষের কল্পনা শক্তি জাগ্রত হয়েই নিত্যনূতন আবিষ্কারের পথ খুঁজে চলে। পুরাতনের সুরকে বুকে নিয়ে উপেক্ষিত অতীতকে বর্তমানের কুণ্ঠিত সংকুচিত জীবন প্রবাহে তুলে নিয়ে রক্ষণশীল জাতির জাতীয়ত্বের গোপন মন্ত্রের স্বরূপ খুঁজে বেড়ায় লেখক তাঁর রূপকথার কাহিনীতে। একসময় যা ছিল ঠাকুরমা, দিদিমা বা গল্পদাদুর একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্ষেত্রে, আধুনিক কালের উৎসাহী সমালোচক ও লেখকের দল তাকেই আহত করে মনের রসে জারিত করে বাস্তবের জগতে বপন করলেন কল্পলোকের রূপকথার বীজ। সঙ্গে যুক্ত হল লোকমুখে বয়ে আসা ঘটনা প্রবাহ, লৌকিক বিশ্বাস, জাদু ভাষার প্রয়োগে সহজ ঘরোয়া মৃদু বাক্যে লেখা হল রহস্যের ঐক্যতান। মনের কনসার্টে বেজে উঠলো -

‘হাজার যুগের রাজপুত্র রাজকন্যা সবে

রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এলো কবে!

হাঁট মাঁট কাঁট শব্দ শুনি রাক্ষসেরি পুর ---

না জানি সে কোন্ দেশে না জানি কোন্ দূর!’^১

যে কোন মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তার পারিবারিক মানুষজন, পরিবেশ পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিকাঠামো ও নিজের অর্জিত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। বনফুলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। ডাক্তারি পেশায় যুক্ত বনফুলের পিতা সত্যচরণের গান-বাজনা-সাহিত্য চর্চাতেও বিশেষ আগ্রহ ছিল। হিতবাদী, বসুমতী, প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকার মতো বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার পাশাপাশি বহু সাহিত্যিকের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। পারিবারিক সূত্রে বনফুলও তাই শিশুকাল থেকেই সাহিত্যচর্চার বাতাবরণে বেড়ে উঠতে শুরু করেছিলেন। একদিকে বনফুলের উদারমনস্ক ডাক্তার পিতা এবং অন্যদিকে রক্ষণশীল কাকা চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং স্কুল মাস্টারমশাই রামচন্দ্র বাঁ বিশেষভাবে বনফুলের চরিত্রে প্রভাব ফেলেছিলেন। এর ওপরে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার কারণে ছোটবেলা থেকেই তাঁর মানসিকতা ভাবালুতা মুক্ত এবং যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে নির্মোহ দৃষ্টিতে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সংস্কারমুক্ত মানবিক চিন্তাভাবনা এবং সত্যাস্থেষণের উন্মুক্ত উদার শুদ্ধ জীবন-সত্য বোধ বনফুলের সাহিত্যকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা যুক্ত ভিন্নস্বাদী করে তুলল। নির্ভেজাল শিল্পী-সত্তা নিয়ে বনফুল ত্রিভুবনব্যাপী তাঁর গল্পের প্লট অন্বেষণ করে ফিরলেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তুচ্ছ বিষয় ও ঘটনা জায়গা করে নিল তাঁর গল্পের চৌহদ্দিতে। বনফুল একজন বিজ্ঞানমনস্ক কবির বৈজ্ঞানিক সুলভ নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে পরিমিত হাস্যবোধের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত অথচ অত্যাশ্চর্য এক জগতকে খুঁজে পেলেন শিশু ও কিশোরদের মধ্যে। শিশুদের মনের নানা প্রবৃত্তি নিয়ে তিনি যেমন স্নিগ্ধ হাস্যরসিকতা করেছেন, তেমনি সেই প্রবৃত্তির মধ্যে দিয়ে শিশুদের বিশুদ্ধ আত্মবিশ্বাস ও আত্মশুদ্ধিকেও তুলে ধরেছেন অনায়াসে। শিশু মনের নতুন কৌতূহল নতুন উদ্দীপনাকে এক ব্যতিক্রমী শিল্পসৃষ্টিতে অস্থিত করে দুর্দান্ত প্রাণশক্তিতে তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছোট ছোট গল্প-কথার মধ্যে দিয়ে।

শিশুদের জগত নিছকই কৌতুক আর খেলায় ভরা নয়। সে হল এক সৃষ্টি স্বপ্নের উৎস, কল্যাণ আর মুক্তির আশ্রয়স্থল। তাই শিশুদের কখনো নির্বোধ বা কল্পনা শক্তি রহিত ভাবার কোন যৌক্তিকতা নেই। কল্পনা জগতে হারিয়ে যেতে তারা কোন যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। সাত সমুদ্র পারের তেপান্তরের মাঠে রাক্ষসপুরীর আনাচে-কানাচে তাই

তাদের সহজ বিচরণ। সেখানে তাদের সঙ্গী শুধু পক্ষীরাজ ঘোড়া আর হাতে খোলা তরবারি। বিশ্বজয়ের অঙ্গীকার তাদের চোখে। যুক্তিবাদী মনন সমৃদ্ধ প্রথময় বাস্তববোধ সম্বলিত মানসিকতাকে তাই তারা সহজেই নস্যং করে দিতে পারে উৎকট উবাচকতায়। বনফুল তাঁর বৌদ্ধিক উৎকর্ষতাকে সঙ্গী করে শিশু মনের ফ্যান্টাসির জগতকে স্বচ্ছন্দে অনুধাবনযোগ্য করে তুলেছিলেন তাঁর কলমের ছোঁয়ায়। শিশু মনের গল্প শোনার প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে বনফুল মেতে উঠলেন শিশু-কিশোরদের গল্প বলায়। ইংরেজি সাহিত্যে চাইল্ড লিটারেচার বা জুভেনাইল লিটারেচার ধারার প্রচলন থাকলেও বাংলা সাহিত্যে ছোটদের জন্য রচিত সাহিত্য শিশু-কিশোর সাহিত্য নামেই চিরকাল পরিচিত। রসাস্বাদনের বিচারে শিশু-কিশোরদের মধ্যে তারতম্য থাকলেও ফ্যান্টাসির জগতে সচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে শিশু-কিশোর উভয়েই সমান আগ্রহী। আসলে বয়সের প্যারামিটারে শৈশব-বাল্য-কৈশোরের মতো তিনটি ধারা মূলত ছয় বছরের ব্যবধানে বুদ্ধির মারপ্যাঁচে ক্রমাশয়ে পরিণত হয়ে উঠতে থাকে। আসলে শৈশব থেকে কৈশোরের যাত্রাপথে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ভরা চোখ আর কৌতূহলী মন নিয়ে শিশু-কিশোর সকলেই আন্দোলিত হয় এক অজানা রহস্যের মোড়ক উন্মোচনে। সেই সৌন্দর্যকেই যুক্তির পারস্পর্যে পরিণত মনের মানুষরা মায়া রহস্যের অনির্বচনীয় কৌতুক লীলাকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় স্থান দেয় তাঁদের রচনার মধ্যে। সৃষ্টি হয় শিশু-কিশোর সাহিত্য।

রবীন্দ্র-ভাব-পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে কল্লোলীয় মনোভঙ্গির ছকভাঙ্গা পথ পেরিয়ে বনফুলের শিল্পী সত্তা এক ভিন্ন আঙ্গিকে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে বড় গল্পের চকিত আভাসে পাঠক কুলকে চমকিত করে তুললো। বিষয়বস্তুর বিচারে, চরিত্রাঙ্কনের সজীবতায়, বর্ণনা ভঙ্গীর চমৎকারিত্বে, আঙ্গিকের আধুনিকত্বে, জীবন দৃষ্টির স্বতন্ত্রতায় বনফুলের ছোটগল্প বিশ শতকের আধুনিক ছোটগল্পের আনুভূমিক স্তরে এক নবতর শিল্পরূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। বনফুল কোনদিনই বন্ধনহীন যুক্তিতর্কের দুনিয়া বহির্ভূত কল্পরাজ্যের জগতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিষ্ঠিতে মাপতে চাননি। বরং তাঁর মনের গোপনে জমে থাকা অসম্ভবের রং মাখা এক স্বপ্নময় জগতের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর শিশু ও কিশোর সাহিত্যের পাতায়। বিশ্ব-সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের মাঝে ঘনীভূত হয়ে ওঠা মায়া রহস্যের অনির্বচনীয় যে কৌতুকলীলা সদা সঞ্চারমান — তার প্রকৃত লীলা-ক্ষেত্র যে শিশু-মনের কুহেলিকাময় প্রচ্ছদপটে, সেই উপলব্ধিকেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে তিনি প্রকাশ করলেন বিচিত্র ভঙ্গিমায় তাঁর গল্পে। হিসাব মেলাবার পরোয়া তিনি কখনোই করেননি, বরং মুন্সিয়ানার সঙ্গে কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসা আর কিছু অনুভূতিকে পাঠযোগ্য করে তুলেছেন সাবলীল ভঙ্গিমায়।

প্রাণের আনন্দে চঞ্চল উচ্ছ্বসিত আবেগ আর ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় সদা রহস্যময় শিশুদের অভিযাত্রিক মনের মানসিক পুষ্টির জন্য প্রয়োজন উপযোগী সাহিত্য। প্রথম চৌধুরী মনে করতেন শিশুদের পছন্দের সাহিত্য রচনা একমাত্র শিশুদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু শিশুদের সামাজিক দৌরাণ্য যতই থাকুক না কেন সাহিত্যলেখার দৌরাণ্য তারা করে না বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন বড়দের মন নিয়ে শিশুপাঠ্য রচনা অসম্ভব বলেই শিশুরা পাঠ্যপুস্তকে মন বসাতে পারে না। আত্মসমালোচনা করে কবি বলেন –

“কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,

আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি।”^২

ছোটদের নীতি শাসনের ঘূর্ণাবর্তে পাক দিয়ে রাখা বড়দের দল শিশুদের জন্য নয় মূলত বড়দের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই শিশু-সাহিত্য রচনা করেন। প্রাপ্তবয়স্করা যা উপলব্ধি করেন শিশুদের ক্ষুধার্ত মন তা থেকেই রস সংগ্রহ করে। তাই শিশু বা কিশোর সাহিত্য নামে পরিচিত সাহিত্য ভাষার সর্বজনীন। সর্বস্তরের মানুষকে আনন্দ দেবার পাশাপাশি শিশু মনেও রোমাঞ্চের চেউ তোলে। শিশু-সাহিত্যের কল্পনার জগতে ছন্দোম্পন্দনের জাগরণ ঘটাতে তাই লা ফঁতেন বা ইভানক্রিলভের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায় বা বনফুলের মত সাহিত্যিকদেরও।

বিংশ শতকে ভারতবর্ষের বৃক্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত রাজনৈতিক পর্যায়ের উত্তাল আবহাওয়ায় মানুষ যখন জীবন সংকটের ভয়াবহ ইতিবৃত্ত রচনা করতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই একটি তীব্র অনুসন্ধিৎসা খেয়াল পোকা হয়ে নড়েচড়ে বসলো বনফুলের মাথায়। বৈজ্ঞানিক বিচিত্রতা আর বর্ণালী স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিচিত্র স্বাদে খামখেয়ালী অভিযানে শিশুদেরকে

সঙ্গী করে মুক্তির আশ্বাস খুঁজলেন বনফুল। ডাক্তারি পেশাকে ছাপিয়ে ওঠা গল্প লেখার নেশায় তাই মনের মধ্যে জায়গা করে নিল শৈশবের উচ্ছলতা, কৈশোরের আবেগ আর শিল্পী মনের গভীরতা। তিনি স্বীকার করেছেন -

“একঘেয়ে এক ছাঁচের লেখা আমি লিখিতে পারি না। প্রতিটি লেখায় আমি নূতন স্বাদ পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।”^৩

একজন সংসারী সাদামাটা ঘরোয়া জীবনের মানুষ বনফুলের জীবনে পরিবারের একটা বড় ভূমিকা ছিল। পরিবারের সকলকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তাঁর পুত্র চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় -

“মন ভাল থাকলে বাবা আমাদের গুছিয়ে গল্প বলতেন। সে গল্প পরে লিখেছেন অন্য কোথাও।”^৪

চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আরও জানা যায় বনফুল “বিচিত্র রসের পাঠক ছিলেন। সব পড়তেন। সমসাময়িক লেখকদের লেখা পড়তেন — অন্যদের পড়তে বলতেন।”^৫

বাংলা কথা-সাহিত্যের জগতে বনফুলের খ্যাতি মূলত ছোটগল্পকার হিসেবে। দু-একটি রেখার টানে জীবনের বিস্তৃতি ও গভীরতাকে ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যঞ্জনাযিত করে তোলাই ছোটগল্পকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পাতা জোড়া বর্ণনার ঘনঘটা, ঘটনা সংঘাতের তীব্রতা থেকে মুক্ত চকিত আভাস আর ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে কল্পনা আর মননের সমারোহে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে অন্তরের অভ্যুত্থিকে তৃপ্তি দেবার যে প্রয়াস ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথের হাতের কলমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, বিশ শতকে বনফুলের হাতে সেই উদ্ভাসের বিচ্ছুরণ ঘটল। মোহিতলাল মজুমদার বনফুলকে একটি পত্রে (২৫. ১১. ১৯৩৮) লেখেন, -

“একটি নূতন form আপনি আয়ত্ত করিয়াছেন — রীতিমত গল্পও নয়, নক্সা-Snapshot-ও নয় — এ একরকম অতি ছোট গল্প। এবং এই সংগ্রহের অধিকাংশই এক সুসম্পূর্ণ রস-কলেবর পাইয়াছে যে আমার মনে হয় ইহা আপনার একটি খুব নূতন কীর্তি বলিয়াই ঘোষিত হইবে।”^৬

বনফুলের মোট ছোটগল্পের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচশো আটষট্টি — যা যেকোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরের সাহিত্যক্ষেত্রে এক দুর্লভ ঘটনা। বনফুলের অধিকাংশ গল্প স্বল্প-পরিসরের। সুপ্রাচীন কাল থেকে ক্ষুদ্রকায় গল্পের ধারাবাহিক ঐতিহ্য ঈশপের গল্পে, পঞ্চ-তন্ত্রের নীতিকথায়, জাতকের কাহিনিতে, পুশকিনের গদ্যময় পদ্যোপাখ্যানে, কিংবা বাংলাদেশের লোককথার হাত ধরে ক্রম-প্রবাহিত হয়ে একসময় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প থেকে অনুগল্পে বা গল্পানুতে পরিণত হয়। বনফুল একদিকে যেমন দীর্ঘকায় উপন্যাস রচনায় পটু ছিলেন, তেমনি ক্ষুদ্র অবয়বে অনুগল্প, গল্পানু রচনাতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রচনার আয়তনের প্রতি গল্পকার বনফুলের অণুবীক্ষণ বিলাসী জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁর হৃদয়তনের গল্পসূত্রকে অনাসক্ত বিশ্লেষণ ভঙ্গিতে সঙ্গত আখ্যান-প্রকরণের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ ও নির্মাণ করে একটি প্রমিত কথন শৈলী গড়ে তুলল বাংলা সাহিত্যে। বনফুল চিরকালই তাঁর রচনা ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা আর দৃষ্টির সচেতনতার ওপরেই জোর দিয়েছিলেন। ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি ভাগলপুর থেকে কলকাতার যোজন বিস্তৃত অঞ্চলের বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গির রসায়নে সরলীকৃত হয়ে কল্পনা, বিশ্বাস, আর অতিলৌকিক রসের যৌগিক বিকিরণে গল্পের প্লটকে সহজেই আহৃত করেছিল, সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সহজাত কৌতুকপ্রিয়তা।

বনফুল তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন —

“মেডিকেল কলেজে থাকিবার সময় আমি ছোট-গল্প লিখিতে আরম্ভ করি। মেডিকেল কলেজে আমি অনেক সময় খালি ক্লাস-রুমে বসিয়া থাকিতাম। প্রকান্ত ঘরে নির্জন গ্যালারিতে বসিয়া থাকিতে খুব ভালো লাগিত। নির্জন পরিবেশ না হইলে আমি লিখিতে পারি না। মেডিকেল কলেজে খালি ক্লাসরুমগুলিতেই সেই নির্জনতা পাইতাম। একদিন ‘বাড়তি-মাশুল’ ‘অজান্তে’ প্রভৃতি চার-পাঁচটি গল্প একসঙ্গে লিখিয়া ফেললাম। লিখিবার পর মনে হইল এগুলি গল্প হইল তো? ‘প্রবাসী’-তেই সব গল্পগুলি পাঠাইয়া দিলাম। সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলাম — ‘এগুলি ঠিক রসোত্তীর্ণ রচনা হইল কিনা বুঝিতে

পারিতোছি না। রচনাগুলির নামকরণও করিতে পারি নাই। আপনাদের যদি ভালো লাগে এগুলির নামকরণ করিয়া ‘প্রবাসী’তে ছাপিবেন। ... তখন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রবাসী’র সহ-সম্পাদক ছিলেন। কয়েকদিন পর তাঁহার একটি পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন — ‘গল্পগুলি পছন্দ হইয়াছে। সবগুলিই ‘প্রবাসী’-তে ছাপিব।’^৭

বনফুলের গল্প রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভূমিকা আর সম্প্রসারণের পর্যায় অতিক্রম করে অত্যন্ত সহজেই ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যাওয়া। বনফুলের গল্প রচনার চিত্রধর্মিতা লক্ষ্য করে পরিমল গোস্বামী বনফুলকে লিখেছিলেন, -

“তোমার চালচলনে এমন একটি ঋজুতা এবং চিন্তায় এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যা তোমার ব্যক্তিসত্তাকে এক অদ্ভুত আকর্ষণ বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল করেছে। তোমার এই চরিত্র তোমার লেখার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত। তোমার ছোটগল্পের মধ্যে তোমার চরিত্রটিকেই আমি দেখতে পাই। ... তুমি যা দেখেছ, যা শুনেছ, তার মধ্যে যেখানেই চিত্রধর্মিতা আছে তাকেই তুমি বেঁধে ফেলেছ গল্পের চেহারায়।”^৮

বনফুলের গল্পের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য সীমা-পরিসীমাহীন কল্পনার বিস্তার। বিচিত্র ধারায় নিত্য-নতুন ছন্দে প্রবাহিত মানবজীবন স্রোতের তীরে বসে বনফুল তাঁর সত্যাত্মস্বী মন আর বৈজ্ঞানিক নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে জীবনের ছোট ছোট গভীর অনুভূতিগুলিকে মানবিকবোধে হৃদয়ের আদ্রতায় বিস্ময়চকিত অনুপম ব্যক্তিত্বে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতোই কৈশোর-যৌবনের উপনিষদ পাঠের মধ্যে দিয়ে বনফুলের জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল।

“তৈত্তিরীয় উপনিষদের আনন্দবাদই হয়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যের মর্মকেন্দ্র। ‘আনন্দাদ্বেষ খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি’ (মন্ত্র সংখ্যা ৫৯) আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি, আনন্দের মধ্যেই জীবনচরণ শেষ করে আনন্দেই প্রতিগমন করে। এই আনন্দতত্ত্বই বিস্তৃত পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর অবয়ব ধারণ করেছিল। কিন্তু সমাজচারণার বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন তারই অপহৃব।”^৯

বনফুল বিশ্বাস করতেন সাধনা দিয়ে লব্ধ জীবনবোধই মানুষকে মনুষ্যত্ববোধে উন্নীত করতে পারে। আর এই সাধনার জন্য প্রয়োজন নিঃস্বার্থ নির্মোহ জীবনদৃষ্টি, পরের উপকার করার উন্নত মানসিকতা — যা গঠিত হয় শিশুকাল থেকেই। বনফুল তাঁর বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ জীবনভাবনা দিয়ে অনুভূতির স্তর পরম্পরা অতিক্রম করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের ভেতর যেমন চিন্তার জটিলতা জাল বিস্তার করে থাকে তেমনি শিশুদের ভেতর থাকে এক দুর্মর আবেগ, অফুরন্ত প্রাণশক্তি। যা দিয়ে তারা অত্যন্ত সহজেই নিয়ম ভাঙার স্বতঃস্ফূর্ত খেলায় মেতে ওঠে। শিশু মনের এই অদম্য অমোঘ শক্তিময় মনস্তাত্ত্বিক উত্থান পতন নানাভাবে বনফুলকে অনুপ্রাণিত করেছিল শিশু-কৈশোর মনের বিচিত্রতার হৃদয় মেলাতে। “সেই কারণেই এই ‘অমোঘ অদম্য’ প্রাণশক্তির কাছে তাঁর প্রত্যাশা বিপুল -

চক্ষে স্বপ্ন চক্ষে ভরসা

আনন্দ উচ্ছ্বল

জীবনের পথে যাত্রা করেছে শুরু

কিশোর কিশোরীর দল।

জানি তোমাদের — মানি তোমাদের দাবি

অতীত-বিদারী, হে অনিবার্য ভাবী,

তোমরা খুলিবে চাবি—

সরাইবে অর্গল

হাসিয়া গাহিয়া নাচিয়া চলেছে সবে

ভবিষ্যতের স্বাধীনতা উৎসবে।

স্রষ্টা যখন নিজেই নবীনকে নব নব স্বাধীনতা উৎসবে ডেকে নিচ্ছেন, তখন তাদেরই হাতে তুলে দেওয়া রচনা সম্ভারে মুক্তবুদ্ধির নির্মল স্রোত প্রবাহিত থাকবেই তা প্রত্যাশিত।”^{১০}

Reference:

১. মজুমদার, শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, ঠাকুরমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা, চতুর্দশবারিংশৎ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৯
২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কবিতা – শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রকাশ – নভেম্বর ১৯৮৩, ছেলেটা, পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থ, পৃ. ৩৪
৩. বনফুল, পশ্চাৎপট, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮, চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২১৫
৪. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বনফুল সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃ. ১৭৬
৫. তদেব, পৃ. ১৭৭
৬. বনফুল, পশ্চাৎপট, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮, চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২৬৯
৭. তদেব, পৃ. ১০৫-১০৬
৮. গল্পগুচ্ছ, বনফুল জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৯, শিলালিপি, পৃ. ৩৬
৯. তদেব, পৃ. ৪৪
১০. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বনফুল সংখ্যা, সম্পাদক : তাপস ভৌমিক, ১৯৯৯, পৃ. ৭৮